অচির ফাল্গুনী

তিলোত্তমা মজুমদার

কলকাতা মহানগরে ডা. রজনী ঘোষ রোড অতি সংক্ষিপ্ত একটি পথের নাম। লেক গার্ডেন্স এলাকায় আরও অনেক স্বল্প গুরুত্বের পথ যেমন, এ-ও তাই। স্বল্প গুরুত্বের এই কারণে যে এইসব পথে বাস ট্রামের মতো ভারী গণ পরিবহণের চলাচল নেই। ব্যক্তিগত গাড়ি বা ট্যাক্সি খুবই স্বচ্ছন্দ। তবে ইদানীং এইসব পথেও যানজট হতে দেখা যাচ্ছে। অনেক পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল উঠছে। তার সরঞ্জাম নিয়ে ট্রাক ঢুকে পড়ে। রাস্তা সংকীর্ণ করে দেয়।

ডা. রজনী ঘোষ রোডের বাড়িগুলোও পুরনো। বেশিরভাগই দোতলা-তিনতলা। কিছু একতলা বাড়িও আছে। তাদের স্থাপত্য সুন্দর। কত বছর ধরে বহু গাছ-লতা তাদের ঘিরে আছে। এমনই একটি ছোট্ট হলুদ রঙা বাড়ি অনেকদিন যত্ন পায়নি। শ্রীহীন নয়। কিন্তু আর সব বাড়ির মতো সম্পন্নতার ঔজ্জ্বল্য তার নেই। এই বাড়িতে থাকে দীপ আর তার মা আলোকময়ী। দীপ পিতৃহীন। সে যখন ছোট ছিল, একটি দুর্ঘটনায় তার বাবা মারা যান। আলোকময়ী স্বামীর জায়গায় চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না বলে তাঁর বেতন হল ছোটরকম। জীবনবিমার কিছু টাকা আর কিছু সঞ্চয় ও ভবিষ্যনিধিগুলি দিয়ে দীপকে তিনি মানুষ করেছেন।

আলোকময়ীর বাড়ি ছাড়িয়ে তিনটি বাড়ি পার হলে এক সাদা দোতলা বাড়ি। ডা. রজনী ঘোষ রোডের প্রান্তে, যেখানে ডোভার রোড তাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে, সেই অন্তিম কোনায় এই দোতলা শেষের দিক থেকে দ্বিতীয়। তার পাশে খানিকটা বাগানসমেত বহু পুরনো লাল ইটের বাড়ি ছিল। বাড়িটি সংরক্ষণ করলে দর্শনীয় হতে পারত। কিন্তু তার গায়ে অশ্বত্থ গজিয়েছিল। মোটা শেকড় চাড়িয়ে গিয়েছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কোনও মানুষ সেখানে বসবাস করেনি দীর্ঘকাল। ভাম, সাপখোপ আর পাখির বাসা। সেই বাড়ি ভেঙে এখন সাততলা হর্ম্য। তাতে দোকানপাট, তাতে আপিস, তাতে মানুষের ঘরবসতি। এই বিরাট বাড়ির ছায়া পড়ে সাদা দোতলা বাড়িটিতে। আগে গাছপালার ছায়া পড়ত। পোড়ো বাগানে একটি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। ফুল ফুটলে বাতাসে গন্ধ ভেসে আসত। রঞ্জু অর্থাৎ রঞ্জাবতী ভালবাসত সেই গন্ধ।

রঞ্জাবতীও ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে। এই দিক থেকে দীপের সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে। রঞ্জাবতীর সঙ্গে তার দাদা অরুণেশের তফাত পনেরো বছরের। অরুণেশের স্ত্রী দেবিকা। বস্তুত অরুণেশ আর দেবিকাই রঞ্জাবতীকে মানুষ করেছে। তাদের চোদ্দো বছরের ছেলে রিন্টু অর্থাৎ কৌশিক এবং রঞ্জাবতীর সম্পর্ক অনেকখানি ভাই-বোনের মতো।

রঞ্জাবতীর বয়স এখন চব্বিশ। সাম্মানিক বাংলা নিয়ে স্নাতক হওয়ার পরে সে কম্পিউটারের কিছু প্রশিক্ষণ নেয় এবং শহরের পার্ক স্ট্রিটে একটি নাম করা বইয়ের দোকান 'বুক ওয়ার্ল্ড'-এ কাজ পেয়ে যায়। এই দোকান আগে শুধু ইংরিজি বই রাখত। সম্প্রতি তারা বাংলা বইয়ের বিভাগ খুলেছিল এবং কর্মী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। রঞ্জাবতী তা লাভ করে। অরুণেশ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। তবু রঞ্জাবতী চাকরির জন্য মরিয়া ছিল দীপের কথা ভেবে। সে আর দীপ শৈশবে বন্ধু ছিল। কৈশোরে তা প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়।

আলোকময়ী বা অরুণেশের তা জানা আছে। দুই পরিবারের সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল। দীপ ও রঞ্জাবতী অনায়াসে পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত করতে পারে।

রঞ্জাবতীর চেয়ে তিন বছরের বড় দীপের বয়স এখন সাতাশ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া দীপ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়েও চাকরির ক্ষেত্রে খুব সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন ঠিক কেমন দীপ জানে। আলোকময়ীর সংসারে লেপ-তোষকের বয়স দীপের সমান। বাড়ির জন্য শেষবার পর্দা কিনেছিলেন দশ বছর আগে। তাদের সোফাগুলি পুরনো ধাঁচের এবং মলিন। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে, ছাদে জল বসে যাচ্ছে। রাজমিস্ত্রি সেসব সারিয়ে তোলার জন্য লাখ টাকার ফরমায়েশ দিয়েছিল। আলোকময়ী সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে ছাদ সারিয়েছেন। দেওয়াল মেরামত স্থগিত আছে। পুরনো বাড়ির যত্ন লাগে বেশি। আলোকময়ী তাকে পরিচ্ছন্ন রাখেন কিন্তু সারিয়ে তুলতে পারেন না। দীপ ও তার

দীপের কথা অরুণেশ সমর্থন করে। রঞ্জাবতী তার সব কথা বলে বউদি দেবিকাকে। দেবিকা অরুণেশকে জানায়। অরুণেশ বলেছে, "আত্মসম্মানবোধ থাকা অত্যন্ত জরুরি। ওর যখন তা আছে, ওকে সময় দেওয়াই উচিত। আজকাল অনেক মেয়েই সাতাশ-আঠাশ বছরে বিয়ে করে।"

দেবিকা বলে, "ঠিকই বলেছ। বিয়ের পরে অভাব, অভিযোগে অশান্তি হওয়ার চেয়ে একটু অপেক্ষা করাই ভাল। আমাদের রঞ্জুর চাকরিটাও তো আর বিরাট কিছু নয়।"

রঞ্জাবতী ভেবেছিল অন্তত দেবিকা তাকে সমর্থন করবে। তা হল না দেখে ক'দিন সে মুখ ভার করে রইল। দীপের সঙ্গে দেখা করল না। দীপও দেখা করার জন্য জোর করল না। ঝগড়া তাদের এই প্রথম নয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের চালচিত্র পাল্টায়। মান-অভিমানের অভিঘাতমাত্রাও পাল্টায় তার সঙ্গে। দীপের মুখ দেখে আলোকময়ী আন্দাজ

রঞ্জাবতীও ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে। এই দিক থেকে দীপের সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে।

মায়ের চালচলনে কেবল ন্যূনতম প্রয়োজন সাধনই প্রাধান্য পায়। স্বচ্ছল পরিবারে বড় হওয়া রঞ্জাবতীকে সে এই পরিস্থিতিতে টেনে আনতে চায় না।

চাকরি পাওয়ার পরে রঞ্জাবতী বলেছিল, "তুমি তো টুকটাক কিছু রোজগার করছই দীপ। মাসিমার এখনও আরও সাত-আট বছর চাকরি আছে। তা হলে কেন আমরা বিয়ে করতে পারি না? দাদা আছে। আমি আছি।"

দীপ শুনে হেসেছিল। বলেছিল, "রঞ্জু, আমি মন থেকে সায় পাচ্ছি না। মায়ের চাকরি, অরুণদার রোজগার, এসবের ওপর নির্ভর করে আমরা বিয়ে করে ফেলব? তুমি যে টাকা পাও তাতে আজকাল চলে না। তুমিও তা জানো।"

"তুমি ভাল কিছু পেয়েই তো যাবে।"

"আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করো তো একথা?"

"হ্যাঁ, করি। এভাবে বলছ কেন?"

"তাহলে আর ক'দিন অপেক্ষা করো। ভাল কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। দেখো।"

করেছিলেন তার মন ভাল নেই। দীপ কলেজ যেতে শুরু করার পর থেকেই তিনি আর খুব বেশি তার ঘরে আসেন না। শুধু রবিবারগুলিতে দীপের উপস্থিতিতে তার ঘরের কোনাখামচির ঝুল, ধুলো সাফাই করার উদ্যোগ তিনি নিয়ে থাকেন। আজ রবিবার নয়।

আলোকময়ী ছেলের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "দীপ।"

দীপ সাড়া দিল, "কী বলছ?"

"কথা ছিল। ব্যস্ত আছিস?"

"আমার আর কীসের ব্যস্ততা মা? ভেতরে এসো।"

আলোকময়ী দীপের ঘরে এলেন। দীপ বলল, "রাত এগারোটা বাজে। এখনও শুতে গেলে না। কাল আপিস যাবে না নাকি?"

দীপ নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। বাইরের পোশাক পাল্টায়নি। ভাবছিল সম্ভবত। আলোকময়ীর অপরাধী লাগে খুব। তাঁর যদি অনেক টাকা থাকত তবে ছেলেকে ম্যানেজমেন্ট বা ওইরকম কিছু পড়াতে পারতেন। অনেকে বলেছিল, বাড়ি বিক্রি করে দাও, কী হবে বাড়ি রেখে! ঠিকই। বাড়ি বিক্রি করে যদি দীপের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যেত, আলোকময়ী তাই-ই করতেন। কিন্তু এ তাঁর একার নয় যে। তাঁর শ্বশুর এবং খুড়োশ্বশুরের সম্পত্তি। দু'জনের সন্তানাদি ধরলে আরও ছ'-সাতজনের অধিকার জন্মায়। তাদের কেউ থাকে দিল্লিতে, কেউ থাকে নয়ডায়, কেউ জব্বলপুরে।

কলকাতায় যে ক'জন, কালেভদ্রে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। আলোকময়ী কার কাছে যাবেন, কাকে বলবেন! তাঁর সহকর্মীরা বলেন, "আরে পুরনো বাড়ির গন্ধ শুঁকে শুঁকে প্রোমোটার হাজির হয়। সইসাবুদের ঝক্কি তারাই সামলায়। তোমার ভাবনা কী?"

আলোকময়ী হাসেন। তিনি জানেন, দু'কাঠা জমির জন্য বিল্ডারদের আগ্রহ নেই। বড় জমি হলে তারা সব ঝক্কি পোহাত হয়তো। এ অঞ্চলে যা কাজ হয়, সব বড়।

বাড়ি বন্ধক দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়াও সম্ভব হয়নি একই কারণে। ওই শরিকি মালিকানা।

কোথাও কোনও দেবস্থান দেখলেই আজকাল দাঁড়িয়ে পড়েন আলোকময়ী। শনিমন্দির থেকে পীরের দরগা—সর্বত্র। হাত জোড় করে ছেলের কথা বলতে বলতে কান্না পেয়ে যায়। ওর কপাল কি এতই খারাপ ঠাকুর? একটা ভাল চাকরি কি ও পেতে পারে না?

দীপ তার বাবার মতো দেখতে। লম্বা, সুগঠিত, সুদর্শন। চাপা রং। চোখে চশমা। সে বরাবরই গম্ভীর প্রকৃতির। এই সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত কিছুই প্রায় করে উঠতে না পারা তাকে আরও বিষাদগম্ভীর করেছে। আলোকময়ী বললেন, "ক'দিন ধরে ভারী চুপচাপ লাগছে তোকে।"

দীপ বলল, "হুঁ।"

"কী হয়েছে?"

"অনেক কিছু।"

"একে একে শুরু কর।"

মা আর ছেলের সংলাপের এই ধরন অনেক পুরনো। দীপের ছোটবেলা থেকে শুরু। খেলা করে ফিরল শিশু দীপ, আলোকময়ী তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে করতে বলতেন, "আজ কী কী হল দীপ?"

"অনেক কিছু।" দীপ বলত।

"একে একে শুরু করো।"

দীপ শুরু করে দিত। "জানো মা, আজ জয় পড়ে গিয়েছিল। আর বিট্টু? ও বলে ওরা সর্দার। সর্দার মানে তো ডাকাতের

দলের লোক, না মা? আর মা, রঞ্জু আজ প্যান্টে হিসি করে ফেলেছে।"
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই বিবরণ পাল্টে গিয়েছে। চরিত্র বদল হয়েছে। জয়, বিট্টু, পিঙ্কির পরিবর্তে এসেছে অয়ন, কিংশুক, অপূর্ব—এইসব নাম। স্কুলের বন্ধুদের নাম। শিক্ষকদের আদ্যক্ষরমণ্ডিত হয়ে ওঠা বা বিষয়ের মধ্যে অন্তরিন করে দেওয়া তাঁদের। জেবি স্যার খুব রাগী মা। আজ থেকে একেবি স্যার আমাদের অঙ্ক নেবেন। জানো মা, ভূগোল স্যারের মাথায় পুরো টাক। মা, দিব্যকান্তি বলছিল ওর মামা নাকি আলাস্কায় থাকেন। আলাস্কায় কেউ থাকে নাকি মা?
দীপ কলেজে যাওয়ার পর আবার কিছু নতুন নাম এসেছে ডা. রজনী ঘোষ রোডের এই ছোট্ট হলুদ বাড়িটায়। দুষ্টুমি বা পাশ ফেলের বিষয় বাদ দিয়ে ক্রমাগত ঢুকে পড়েছে গুরুতর প্রসঙ্গ। স্নাতক হয়ে যাবার পর কে কী করবে! এসবের মধ্যে একটি নাম কখনও পাল্টায়নি। রঞ্জু। রঞ্জাবতী।

আলোকময়ী নড়ে উঠলেন। দীপের গালে কোমল দাড়ি। এখনও একবারও ক্ষৌরি করেনি। একটু পিছনে টেনে আঁচড়ানো চুল। চশমার আড়ালে শান্ত, সুন্দর দু'টি চোখ। শ্রীকণ্ঠে উঁচু হয়ে ফুটে আছে পৌরুষের অস্থি। স্কুলে নিয়মিত ক্রিকেট ও টেবিলটেনিস খেলে বলে তার কবজি ও বাহু অতি সুগঠিত। আলোকময়ীর মনে হল, অনেকদিন পর তিনি ছেলেকে দেখছেন। কবে এমন বড় হয়ে উঠল ছেলেটা? তিনি হেসে ফেললেন। সদ্য চল্লিশ আলোকময়ী, সদ্য ষোলো পেরনো দীপের দিকে চেয়ে বড় আনন্দ পেলেন। নিজের জীবনের নিবিড় গভীর প্রেমের কথা তাঁর মনে পড়ল। জীবনের প্রথম প্রেম যা দীপের বাবা তাঁকে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর কুড়ি বছর বয়স।
আলোকময়ী বললেন, "ভালবাসিস মানে কী রে!"
দীপ অপ্রস্তুত মুখে বলল, "ওঃ মা! তুমি সব বুঝতে পারছ।"
"রঞ্জু তো এখনও ছোট।"

দীপের মুখ দেখে আলোকময়ী আন্দাজ করেছিলেন যে তার মন ভাল নেই।

দীপ যখন একাদশ শ্রেণীতে, এক রবিবারের দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে এসে বসল তাঁর গা ঘেঁষে। বলল, "মা একটা কথা বলব। তুমি রাগ করবে না বলো?"
আলোকময়ী কল্পনাও করতে পারেননি, দীপ কী বলতে চলেছে। তিনি বললেন, "রাগ করার মতো কিছু করেছিস বুঝি?"
"ঠিক বুঝতে পারছি না মা।"
"শুরু করে দাও।"
"মা, মানে ইয়ে, রঞ্জুকে তোমার কীরকম লাগে?"
"ভাল। ওরা সবাই খুব ভাল মানুষ। অরুণ আর দেবিকার তো তুলনা হয় না।"
"রঞ্জুকে আমি ভালবাসি মা। এটা কি অন্যায়?"
স্পষ্ট, অকম্পিত উচ্চারণ। নির্ভীক, দ্বিধাহীন। আলোকময়ী হাঁ হয়ে গেলেন। হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। বিস্ময়ে তাঁর বাকরোধ হল। তিনি অপলক তাকিয়ে রইলেন, ছেলের দিকে। দীপ বলল, "রাগ করলে তুমি মা?"
"মাত্র তিন বছরের ছোট আমার চেয়ে।"
"তুই কি খুব বড়?"
"হুঁ! দাড়ি উঠে গেছে। সামনের বছর আঠারো হয়ে যাব।"
"এ বিষয়ে আমি আর কী বলব?"
"রাগ করলে?"
"না সোনা। রাগ কেন করব? তোমাদের এখন বয়ঃসন্ধি। এসময় এসবের ইচ্ছে হয়। খুব বেশি মেতে উঠলে লেখাপড়ায় তার প্রভাব পড়বে। শুধু এই কথাটাই আমি মনে রাখতে বলব।"
"না। পড়ায় প্রভাব পড়বে কেন? এটা তো বন্ধুত্বই, বলো মা? শুধু একটু বেশি বেশি টান।"
"তাই তো।"
আলোকময়ী ভেবেছিলেন, ছেলেমানুষি। ক'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দশ বছর সম্পর্ক ধরে রেখেছে ওরা।
সেইসময়, তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী সঞ্জয়কে সব বলেছিলেন তিনি। সঞ্জয়ও হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার ছেলে প্রেম করছে? কবে শুনব আমার মেয়েও করছে। তারও তো ক্লাস টেন হল। তবে তোমাকে দেখলে মনেই হয় না তোমার এত বড় ছেলে আছে।"
সেই এত বড় ছেলে আজ আরও বড়। আলোকময়ী তার পাশে বসে আছেন।
দীপ বলছে, "রঞ্জু বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মা।"
আলোকময়ী বললেন, " তা তো হতেই পারে। বন্ধুদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।"
"মা, আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় এখন।"
"ওকে বুঝিয়ে বল যাতে আর কিছুদিন অপেক্ষা করে।"
"কতদিন মা? কতদিন আটকে রাখব ওকে?"
"ও কি আটকা থাকতে চাইছে না?"
"না না। সেকথা ও কখনও বলেনি। বলে, চব্বিশ বছর হয়ে গেল আমার। কবে আমরা বিয়ে করব, কবে আমার বাচ্চা হবে। কবে মানুষ করব! বাচ্চার জন্য পাগল। রাস্তায় বাচ্চা দেখলেই হল। পুরো আদেখলার মতো করে।"
"মেয়েদের একটু বাচ্চার আকাঙ্ক্ষা থাকেই রে। রঞ্জু রন্টিকে সারাক্ষণ আগলে বসে থাকত, মনে নেই?"
"সে তো রন্টি ওর ভাইপো।"
"না রে। সব মেয়ের এমন কাঙালপনা থাকে না।"
"মা, বাচ্চা মানুষ করব কী করে? তুমি জানো, টাকাপয়সা না থাকলে আজকাল বাচ্চা মানুষ করা কত কঠিন। ভাল স্কুলে পড়াতেই তো কত খরচ। ক্রমশই আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে সেইসব। আমি ভাবছি মা, আমি ওকে বলব, ও চাইলে আর কাউকে বিয়ে করে নিক।"
"এটা ঠিক শোনাচ্ছে না। তোর ওর ওপর টান কমে গেলে আলাদা কথা।"
"তা কেন হবে? টান ঠিকই আছে।"
"তবে অন্য কিছু ভাব দীপ। এতদিনের সম্পর্ক, এভাবে কেন ভেঙে ফেলবি?"
"ও আমার সঙ্গে দেখা করছে না।"
"তাতেই তোর মনখারাপ। ওকে ছেড়ে বাঁচবি তুই?"
"আমার কীরকম ভয় করছে মা।"
"কীসের ভয়?"
"আমি জানি না। তোমাকে বলিনি, কাউকে বলিনি, ডয়েশ মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য লোক চেয়েছিল, আমি আবেদন করেছিলাম। পেয়ে গেছি।"
"পেয়ে গেছিস? ব্যাঙ্কে চাকরি? এত বড় খবরটা তুই এভাবে দিচ্ছিস?"
"মা। তুমি খেয়াল করোনি। আমি বললাম উত্তর-পূর্বাঞ্চল। আমার পোস্টিং হবে

অসম মণিপুর মিজোরাম সীমান্তে। পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট গ্রামে। ওইসব অঞ্চলে পর্যটক যাওয়া শুরু করেছে এখন। ব্যাঙ্কগুলোর নিজস্ব প্রতিযোগিতা এমন জায়গায় চলে গেছে যে দেশের কোনায় কোনায় তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদের। চাকরিটা ভাল, আবার খারাপ। কারণ, আমাকে চলে যেতে হবে মণিপুরের ডোলিং বলে একটা জায়গায়। তিন বছরের আগে চাকরি ছাড়তে পারব না। যদি ছাড়ি বিরাট অঙ্কের টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই তিন বছরে যে কোনও দুর্গম জায়গায় আমাকে পাঠানো হতে পারে। বছরে একবার বাড়ি আসা যাবে দু'সপ্তাহের জন্য। কোম্পানি বিমান ভাড়া দিয়ে দেবে। কাজে উন্নতি করতে পারলে তিন-চার বছর পরে কোনও শহরাঞ্চলে কাজের সুযোগ পেতে পারি।"

"এরকম চাকরি তোর করার প্রয়োজন কী বাবা?"

"একটাই প্রয়োজন। টাকা। মাইনেটা বেশ ভাল দেবে যে মা। সেইটাই তো টোপ। ভেবে দেখো মা, আমার কমার্স ডিগ্রি নেই, বেসরকারি ব্যাঙ্ক বলে ব্যাঙ্কিং সার্ভিস পাশ করতে হল না। হাঁ করে অপেক্ষা করতে হল না কবে কোন ব্যাঙ্কে শিকে ছিঁড়বে। সাতাশ বছর বয়সে এই সুযোগ না নিয়ে আমার উপায় কী বলো?"

"অত দূরে চলে যাবি তুই? বছরে একবার আসবি?"

আলোকময়ীর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। দীপ বলল, "তার চেয়ে বড় কথা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গ্রাম্য এলাকা। সমতলের মানুষদের ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। প্রচুর জঙ্গি সংগঠন যারা নিজেদের ভারতীয় বলে স্বীকার করে না। তারা ব্যাঙ্ক লুঠ করতে পারে। মানুষ খুন করতে পারে। ধরে, বন্দি করে মুক্তিপণ দাবি করতে পারে। ভয় সেখানেই।"

"মা গো! এসব তো কাগজে পড়ি দীপ। তোকে তার মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে কেন? না না। তুই আরও দ্যাখ। আরও চেষ্টা কর। আমি রঞ্জুকে বুঝিয়ে বলব। সে আমার কথা ঠিক শুনবে।"

"মা, রঞ্জু প্রধান কারণ নয়। আমার ঘেন্না ধরে গেছে নিজের ওপর। নিজেকে এরকম নিষ্কর্মা অসহায় দেখতে ভাল লাগে না। এসপার ওসপার সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হবে। মাত্র তো তিনটে বছর। তুমি বারণ কোরো না।"

ও বাড়িতেও খবর গেল। দীপ ভাল চাকরি পেয়েছে—এই সংবাদের জন্য তাঁদের সবাইকার আত্যন্তিক আগ্রহ ছিল। খবর এল। কেউ খুশি হতে পারল না। ভাগ্য বড় দেরি করে দীপকে কিছু দিল, কিন্তু উদার হাতে দিতে পারল না। এর চেয়ে যদি দীপ সেনাবাহিনীতে চাকরি পেত বরং ভাল হত। রঞ্জাবতী আলোকময়ীকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আঁচলে বার বার চোখ মুছতে লাগল দেবিকা। রন্টি বলল, "দীপকাকু, মণিপুর খুব সুন্দর জায়গা। আমি নেটে দেখে নিয়েছি। পরের বছর আমিও চলে যাব তোমার সঙ্গে। প্লেনে চেপে। কিন্তু পিসিমণি এত কাঁদছে, মা কাঁদছে, আলোকদিদা.....তবু তুমি যাচ্ছ কেন?"

একমাত্র অরুণেশ কোনও আপত্তি করেনি। সেও বিষণ্ণ, চিন্তিত। কিন্তু আপত্তি করতে পারেনি। একজন পুরুষ হিসেবে দীপকে সে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছে। এই বয়সের একটি ছেলের পক্ষে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার গ্লানির চেয়ে বেশি অপমানজনক আর কিছুই হতে পারে না। সে বলল, "সব ঠিক থাকবে দীপ। কিছু

ভাবিস না। যা করা উচিৎ, তুই তাই করেছিস। জঙ্গি সংগঠনগুলোর মনোভাব এখন বদলে যাচ্ছে। তারাও চায় তাদের গ্রাম শহরে উন্নয়ন হোক। সরকারি উদ্যোগে যদি না হয়, বেসরকারি উদ্যোগেই হোক। আমরা দূর থেকে দেখি বলে অনেক বেশি ভয় পাই।"

দীপ হাসল। কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল অরুণেশের দিকে। অরুণেশ তাকে জড়িয়ে ধরল। সম্প্রতি সে গাড়ি কিনেছে। তারই গাড়িতে দীপ চলল বিমানবন্দরের দিকে। সবাই সঙ্গে ছিল। দীপের আর ভয় করছিল না। মাঝখানে দু'সপ্তাহ সে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তার চেয়েও ছোট সব ছেলেরা ছিল সেখানে। তারাও যাবে কোনও বিজনে, নির্জনে বা দুর্গমে। পরিবার প্রিয়জন ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু ছেড়ে যাওয়া অত সহজ নয়। বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট হতে লাগল দীপের। টিকিট আর পরিচয়পত্র নিয়ে সে যখন ঘেরাটোপ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল, এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, ফিরে যাবে। ছুটে চলে যাবে সবার কাছে। সে তো মাকে ছেড়ে থাকেনি কোনওদিন। রঞ্জাবতীকে ছেড়ে দূরে যায়নি। সে ঘুরে দাঁড়াল। কতগুলো ঝাপসা হাত, সেও হাত তুলল। সে জানে, তার হাতখানাও ঝাপসা দেখছে অন্যরা। কত দূর, কোন অজানা জীবনে চলে যাচ্ছে দীপ। বড় বিষাদে থাকবে সবাই কয়েকদিন।

২

দশ বছরের প্রেম এক নতুন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। দীপের সঙ্গে সিনেমা, দীপের সঙ্গে বই কিনতে যাওয়া কলেজ স্ট্রিটে, দীপের সঙ্গে ক্যাফে, শিল্পমেলায়, বইমেলায়, লেকে, নলবনে। রঞ্জাবতীর জীবনে দীপ ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ও নিত্য। সে যখন দূরে চলে গেল, রঞ্জাবতীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। চাকরি না থাকলে সে হয়তো পাগল হয়ে যেত। আলোকময়ীর একাকিত্ব ভয়াবহ। আজকাল রঞ্জাবতী আলোকময়ীর কাছে অনেক বেশি যায়।

প্রায় রাতে দীপ ফোন করে। কথা হয় কিছুক্ষণ। দীপ ডোলঙের গল্প করে। ছোট্ট কিন্তু জনবহুল গ্রাম ডোলং। বিদ্যুৎ বণ্টনের একটি কেন্দ্র আছে এখানে। মণিপুরের প্রাণকেন্দ্র ইম্ফল থেকে তামেঙলাঙ, উখরুল বা সেনাপতি জেলায় যেতে গেলে এই ডোলং পার হয়ে যেতে হয়। হাঁসের গলার মতো সংকীর্ণ এই গ্রাম। মূল রাস্তা কোনও কারণে বন্ধ থাকলে ডোলং হল একমাত্র পথ। একটু ঘুরপথ হয়, কিন্তু সহায়ক রাস্তা হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের একটি ছোট শাখা ছাড়া ডয়েশ মাহিন্দ্রা এখানকার দ্বিতীয় এবং একমাত্র বেসরকারি ব্যাঙ্ক।

দীপের কোনও ধারণাই ছিল না, মণিপুরে এত পর্যটন কেন্দ্র আছে এবং এত লোক সেখানে বেড়াতে যায়। মাও, মারাম, কারং, তামেই, কউরু, লামিয়াং, খ্যাঙখুই, হুনডঙ, কামজোঙ।

ব্যাঙ্কে কর্মী মাত্র তিনজন। দীপ, রাকেশ নামে এক বিহারী ছেলে আর রজনীশ ডি সুজা, মণিপুরী খ্রিস্টান। রজনীশ তিন বছর কলকাতায় পড়াশোনা করেছে। বাংলা বুঝতে পারে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে, মণিপুরের হরফ আর বাংলা অক্ষর প্রায় একইরকম। ইদানীং কয়েকজন প্রাজ্ঞ জাতীয়তাবাদী মণিপুরী পণ্ডিত নিজস্ব হরফ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন।

ব্যাঙ্কে দীপ প্রধান। তাদের সবাইকেই সব কাজ করতে হয়। প্রচারের জন্য জেলায় ঘুরতে হয়। হিসেব দেখতে হয়। কাউন্টারে বসতে হয়। উখরুল পেরিয়ে সেনাপতি জেলায় মায়ানমার সীমান্ত। দীপ সেখানে গিয়েছে দু'বার। সে প্রাণপণ পরিশ্রম করছে। গ্রামে-গ্রামান্তরে বেসরকারি ব্যাঙ্কিং- এর ধারণা গড়ে তোলা কঠিন কাজ। তাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। বোঝাতে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কী। কীভাবে তা বেসরকারি ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা বজায় রাখে। এর জন্য তাকে পড়াশোনা করতে হয়। যে কিছুই জানে না তার প্রশ্নও যেমন মৌলিক বিষয়বস্তুর ধারণা দাবি করে, যে কিছু কিছু জানে তার কাছেও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হয় সংশয়াতীতভাবে।

মণিপুর স্বর্গের মতো সুন্দর। এখানকার মানুষজন সরল, ভদ্র কিন্তু সন্দিহান। সমতলের মানুষ সম্পর্কে তারা সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা। দীপ ভুলেও কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করেনি। রজনীশ তার বড় ভরসা।

এই সমস্ত গল্পই দীপ রঞ্জাবতীকে করে। সে কেমনভাবে থাকে, কী খায়, নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হল কি না—সমস্ত রঞ্জাবতীর জানা। এবং সে জানে, দীপ ওখানে ভাল নেই। প্রতিদিনের কাজে, প্রতিটি যাত্রাপথে, প্রত্যেক নতুন গ্রামে সে ভয় পায়। ক্ষোভের মুখোমুখি, ঘৃণার মুখোমুখি হয়ে সে মনে মনে কুঁকড়ে থাকে। মৃত্যুভয় এবং অত্যাচারের সন্ত্রাস তাকে পীড়িত করে।

মাস ছয়েকের মধ্যে নতুন দেশের সব বিস্ময় এবং আগ্রহ শেষ হয়ে গেল। ত্রাসটুকু ছাড়া বাকি সমস্তই হয়ে উঠল একঘেয়ে। রঞ্জাবতীর সঙ্গে তার কথালাপেও চলে এল একঘেয়েমি। আজকাল দীপ যখন তার ভয়ের কথা বলে, কিংবা পাহাড়ের মাথায় ভোরের সূর্যের বিবরণ দেয়, রঞ্জাবতী হাই তোলে। দীপ একদিন ক্ষেপে গেল। বলল, "তোর যদি কথা বলতে ভাল না লাগে, সোজা বলে দিবি। হাইয়ের শব্দ শোনাবি না।"

রঞ্জাবতীও চটে গিয়ে বলল, "আরে! হাই উঠলে চেপে রাখব নাকি? তোমার খারাপ লাগলে ফোন রেখে দাও। আর শোনো রাগ হলেই তুই-তোকারি কোরো না। ওটা ছোটলোকের কাজ।"

"আমাকে তো এখন তোমার ছোটলোক বলেই মনে হবে। বুক ওয়ার্ল্ডে তোমার চারপাশে সারাক্ষণ কত বড় বড় লোক ঘোরাফেরা করে।"

"কী পাগলের মতো বকছ বলো তো! যত বাজে কথা!"

"বাজে কথা? একেবারেই না। পাগলের মতো হলেই তো তুমি বেঁচে যাও, আর কারও গলা ধরে ঝুলে পড়তে পারো। পুরনো একঘেয়ে হয়ে গেছি না আমি! তোমার এখন নতুন চাই।"

রঞ্জাবতী কেঁদে ফেলল। বলল, "তুমি আমাকে এত অপমান করতে পারছ দীপ?"

সে ফোন রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল। এমন বিষাক্ত অপরিচ্ছন্ন কথা কখনও বলেনি তাকে দীপ। বলতে যে পারে, তাও রঞ্জাবতীর মনে হয়নি।

দীপ ভাল চাকরি পেয়েছে— এই সংবাদের জন্য তাঁদের আত্যন্তিক আগ্রহ ছিল। খবর এল। কেউ খুশি হল না।

দীপ কি পালটে গেল? নাকি মনে মনে দীপ এরকমই। রুক্ষ, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত! ভারী অশান্তি চলতে লাগল রঞ্জাবতীর মনে। কাউকে কিছু বলতে পারল না। এই প্রথম তার মনে হল, প্রেম নয়, বিয়ের ইচ্ছা নয়, এমনকী প্রথম চুমু খাবার অভিজ্ঞতাও নয়, মানুষের সবচেয়ে ব্যক্তিগত তার অপমানবোধ। বাইরের অপমানের কষ্ট প্রিয়জনের কাছে বলে হালকা হওয়া যায়। কিন্তু প্রিয় যে অপমান হানে তা কাউকে বলা চলে না। ভারী মনে সে পরদিন কাজে গেল। দেখল, প্রায় দিনের মতো আজও কিংশুক বসে আছেন সোফায়। হাতে বই। পড়ায় মগ্ন। তাদের এই 'বুক ওয়ার্ল্ড' পত্তুয়াদের সম্মানার্থে একটি কোণ সাজিয়ে রেখেছে। কয়েকটি সোফা। টেবিল। মাথার ওপর কাচের মধ্যে দিয়ে আসা নরম আলো। এছাড়াও পুরো স্টোরেই গদি আঁটা হালকা বেঞ্চ। পাঠক বসতে পারবে। কয়েক পাতা উলটে পড়তে পারবে।

এখানে যারা নিয়মিত আসে, কিংশুক তাদের মধ্যে একজন। বই দেখেন, পড়েন। কিনেও নিয়ে যান প্রায়ই। তিনি ধ্যানস্থের মতো পড়ছেন, এই দৃশ্য রঞ্জাবতীর ভাল লাগে। কিংশুক প্রায় ছ'ফুট লম্বা। ছিপছিপে। অনেকটা কাশ্মীরিদের মতো লালচে গায়ের রং এবং চোখ-মুখ। গালে নিখুঁত ছাঁটা দাড়ি। কাঁচাপাকা। মাথায় ঘন কাঁচাপাকা চুল। নীল জিন্সের ওপর খদ্দরের নানা রঙের পাঞ্জাবি—এই তাঁকে পরতে দেখেছে রঞ্জাবতী।

সে ভেবেছিল কিংশুকের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মগ্নতা ভেঙে দেবে না, কিন্তু কিংশুকই তাঁকে ডাকলেন। বললেন, "কফি হবে নাকি?"

রঞ্জাবতী দু'কাপ কফি নিয়ে কিংশুকের মুখোমুখি বসল। এই সময় ক্রেতা খুব কম আসে। বেশিরভাগই আসে তাদের কফি কর্নারে কফি খেতে। কিংশুক চশমার তলায় চোখ হাসিয়ে বললেন, "আজ বুঝি রঞ্জাবতীর মন খারাপ?"

মেঘনিন্দিত কণ্ঠ তাঁর। বাচনভঙ্গি অন্তরস্পর্শী। কিংশুক একজন নাট্যকার এবং অভিনেতা। তাঁর নানাবিধ উদ্ভাসিকতা আছে। যেমন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েও তিনি যাননি কারণ তিনি মনে করেন, অভিনয়ের শেষ জায়গা এবং সর্বোত্তম জায়গা মঞ্চ। কলকাতা পুরসভায় তাঁর একটি কাজ আছে। যাকে তিনি বলেন মশা মারা কেরানির কাজ। সম্ভবত মশা নিধন বিভাগের তিনি একজন কর্মী। অধ্যাপক হলেই তাঁকে মানাত ভাল। কিংবা আপাদলম্বিত সাদা পোশাক পরা খ্রিস্টান ধর্মযাজক।

তাঁর কথা শুনে রঞ্জাবতী হাসল। হাসির মধ্যে হ্যাঁ বা না দু'রকমই থাকতে পারে। কিংশুক বললেন, "মিষ্টি মেয়ে রঞ্জাবতীর মনখারাপে দারুণ ক্ষতি।"

রঞ্জাবতী বলল, "কার ক্ষতি? কারও নয়।"

"এই তো ধরা পড়ে গেলে! কী হয়েছে? দাদা বকেছে? নাকি দীপবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছ? তিনি ভাল আছেন তো?"

রঞ্জাবতী ঠোঁট কামড়াল। কিংশুকের সঙ্গে দু'-চারবার কোনও ক্যাফেতে আড্ডা দিয়েছে সে। অসম্ভব প্রাণবন্ত এই মানুষটির সঙ্গ তার ভাল লাগে। কিন্তু দীপমণ্ডিত ছিল বলে অন্যদের সঙ্গে বেশি মেলামেশার অবকাশ ছিল না। সে বলল, "হ্যাঁ। দীপ ভাল আছে।"

"তা হলে? আচ্ছা, ছাড়ো ওসব। মন ভাল রাখার জন্য নাটক দেখতে হয়। না বোলো না। বিহারের একটা নাটক আছে আজ। 'সমঝোতা'। অবশ্যই দেখো। আত্মা প্রসারিত হবে। আমি প্রবেশপত্র দিয়ে যাব।"

"নাটক? কোথায়? বাড়িতে বলা নেই। বউদি দেরি দেখলে চিন্তা করবে।"

"বাড়িতে ফোন আছে। না গেলে নাটকে, পুরে দেব ফাটকে।"
রঞ্জাবতী হেসে ফেলল। কিংশুক বললেন, "এই তো। হাসো হাসো। হাসলেই দেখবে সব কষ্ট চলে যাচ্ছে।"
রঞ্জাবতী নাটক খুব বেশি দেখেনি। 'সমঝোতা' দেখে সে অভিভূত হয়ে গেল। একলা নাটক দেখা, সিনেমা দেখা—সে ভাবতেও পারত না আগে। নাটক সেভাবে টানতও না তাকে। আজ তার মনে হল, 'সমঝোতা' তার জীবনে অনেক কিছু সংযোজন করে দিল। নাটক দেখা এবং নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হওয়া, রঙ্গালয়ে বহু অচেনা লোকের মধ্যে একাকী কোনও ভাবনায় ডুবে যাওয়া, দীপকে বাদ দিয়ে ভাল কিছু করার সূচনা। আর কী? সে দেখল তার মনের ভার উধাও হয়ে গিয়েছে। কৃতজ্ঞ বোধ করল সে কিংশুকের প্রতি। পরদিন দেখা হলে ধন্যবাদ জানাবে। কী বলবে? ভাবতে ভাবতে জনতায় মিশে রঙ্গালয় থেকে বেরুচ্ছিল সে। দেখল মূল ফটকের কাছে

রঞ্জাবতী হেসে ফেলল। কিংশুক বললেন, "এই তো। হাসো হাসো। হাসলেই দেখবে সব কষ্ট চলে যাচ্ছে।"

কিংশুক দাঁড়িয়ে আছেন। আনমনে সিগারেট টানছেন। সে কাছে আসতেই কিংশুক তাকে দেখতে পেলেন। হেসে বললেন, "এই যে মাদাম।" রঞ্জাবতী দাঁড়াল। সবিস্ময়ে বলল, "আপনি নাটকটা দেখছিলেন?"
"নিশ্চয়।"
"আশ্চর্য! সঙ্গে কেউ ছিল আপনার?"
"হুঁ হুঁ! ছিল! এক প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ দর্শক। ওই মঞ্চ। ওই নাট্যকার এবং অভিনেতা। আর একটি ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে যে এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"
"আমি মোটেই ছোট নই।"
"মিষ্টি যে তা স্বীকার করছ তা হলে!"
"ইশশশ! মোটেই না! কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে বসলেন না কেন?"
"কেন?" কিংশুক সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে জুতোয় পিষে বললেন, "চলো। মেট্রোয় যাবে তো? এগোনো যাক।"
"আমার প্রশ্নের জবাব দিন।" রঞ্জাবতী কিংশুকের পাশে পাশে চলতে চলতে বলল। কিংশুক বললেন, "তোমার সঙ্গে বসিনি কারণ তুমি আমাকে ভুল বুঝতে পারতে। ভাবতে পারতে, একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গপরশ পাবার জন্যই আমি তোমাকে আলো-আঁধারি নাট্যালয়ে টেনে এনেছি। এই বুড়োর কি সম্মান থাকত তা হলে? মনের মধ্যে পাখির ঘর, পাখি চলল তেপান্তর। কী বুঝলে?"
"আমি মোটেই তা ভাবতাম না। আপনার সব হেঁয়ালি আমি বুঝতেও পারি না।"
"জেনে নিলাম। এরপর আর ভুল করব না। আমি কি সাহস করে মাদামের সঙ্গে লেক গার্ডেন্স পর্যন্ত যেতে পারি? এর মধ্যে কোনও হেঁয়ালি নেই কিন্তু।"
"কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাবে যে। বাড়িতে ভাববে না?"
"কী আর এমন দেরি হবে? এই তো টালিগঞ্জে থাকি। ভৃত্যের মা রান্না করে দিয়ে যায়। আমি বাড়ি ফিরে খাই। বই-টই পড়ি, আর ঘুমোই।"
"আপনি একা থাকেন?"
"আমি কখনও একা থাকি না রঞ্জাবতী। এ জগৎ এত সুন্দর, এত বিরাট, এত সহৃদয় মানুষ চারদিকে—একা থাকার উপায়ই নেই। মস্ত আকাশ উদার হাওয়া, তারই মধ্যে সকল পাওয়া।"
"আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন কিংশুকদা।"
"ধ্যুৎ! আমি মোটেই তোমার দাদা হতে চাইব না। বন্ধু হব। দলে আমাকে সবাই নাম ধরে ডাকে।"
"আরে! তো কী বলে আমি ডাকব আপনাকে?"
"অধমের নাম কিংশুক।"
রঞ্জাবতী হেসে উঠল। বলল, "আমাদের দেশটা এখনও কিন্তু আমেরিকা হয়ে যায়নি। আপনাকে নাম ধরে ডাকছি শুনলে লোকে হাঁ করে দেখবে। দলে যা চলে, বাইরে তা চলে নাকি?"
কিংশুক বললেন, "লোককে খুব গুরুত্ব দাও বুঝি! বেশ, লোকের সামনে ডেকো না। শুনছেন শুনছেন বলে চালিয়ে দিও।"
আবোল-তাবোল বকতে বকতে কখন বাড়ির কাছাকাছি এসে গেল খেয়ালই করেনি রঞ্জাবতী। কিংশুক বললেন, "এইবার আমি ফিরে যাব।" রঞ্জাবতী বলল, "এতদূর যখন এলেন, বাড়িতে চলুন।"
"আর একদিন।" কিংশুক হাসলেন। রঞ্জাবতী এত বুঁদ হয়ে ছিল যে কিংশুক চলে যেতেই তার খুব ফাঁকা লাগল। সে এক দৌড়ে কিংশুকের কাছে এসে বলল, "কাল আসবেন তো? বুক ওয়ার্ল্ডে?"
কিংশুক রঞ্জাবতীর মাথায় আলতো হাত রেখে বললেন, "বেশ তো। পাখিটা ডাকলে আরেকটা পাখি উড়ে আসে। এসে চুপচাপ বসে থাকে ঠিক তার পাশে।"

৩

বাড়িতে ঢুকতেই দেবিকা বলল, "হ্যাঁরে, সেই যে নাটক দেখতে গিয়ে সেলফোন বন্ধ করেছিস, তারপর খুলবি তো। ওদিকে দীপ অস্থির হয়ে উঠেছে। কখন থেকে তোকে চাইছে বেচারা!"
এতক্ষণ যে ভাল লাগার ঝিলিমিলিতে সে ছিল, হঠাৎ যেন এক ফুঁয়ে কেউ নিভিয়ে দিল। সে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, "দীপ কখন আমাকে ফোন করবে সেই অপেক্ষায় তো সারা দিন বসে থাকতে পারি না আমি!"
দেবিকা বলল, "এ কী কথা রঞ্জু! ছেলেটা কত দূরে সবাইকে ছেড়ে রয়েছে! একটু কথা বলতে চাইবে না?"
"আশ্চর্য! আমারও তো নিজস্ব জীবন আছে। সময় অসময় আছে। কখনও যদি ওকে অফিসের সময় ফোন করেছি, ও দু'টো কথা বলতে না বলতে রেখে দিয়েছে। ও করতে পারে, আমার ফোন বন্ধ বলে সাতকাহন। ব্যাগে রেখেছিলাম। খুলতে ভুলে গিয়েছি।"
"কী হয়েছে রঞ্জু? দীপের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?"
রঞ্জাবতী কোনও জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। তাদের বৈঠকখানা, রান্নাঘর ও খাবার ব্যবস্থা একতলায়। একটি স্নানঘরও আছে। উপরে তিনটি ঘর। আগে একখানা ফাঁকাই পড়ে থাকত। ওতে সংলগ্ন স্নানঘর নেই। এখন রিন্টু ওঘর দখল করেছে। শৌচালয় সম্পর্কে তার মাথাব্যথা জন্মায়নি। যে ঘরে পারে, ঢুকে পড়ে।
ফোন চালু করল রঞ্জাবতী। এগারোটা ডাকছুট। আটটা দীপের। তিনটে দেবিকার। সে গা ধুতে যাবার আয়োজন করল, আর বেজে উঠল ফোনটা। দীপের ফোন ভেবে অবহেলায় তাকাল সে আর সবিস্ময়ে দেখল কিংশুকের নাম। আজই তারা নম্বর দেওয়া-নেওয়া করেছে। সে ফোন তুলল,

বলল, "হ্যালো!" কেন, সে জানে না, তার বুকের মধ্যে দপদপিয়ে উঠল।
কিংশুক বললেন, "লক্ষ্মী মেয়ে, দু'টো কথা। দীপবাবু ফোন করলে ঝগড়া মিটিয়ে নিও। আর আমি একটা নতুন নাটক লিখেছি। পড়বে? কাল নিয়ে যাব তা হলে।"
"হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।"
ফোনের মধ্যে দিয়ে কিংশুকের স্বর কী অসামান্য লাগে! যেন বুকের ভিতর থেকে উঠে আসছে কথা, আর তার গাল কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। সে শুয়ে পড়ল বিছানায়। প্রগাঢ় গম্ভীর ধ্বনির প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে রইল। শ্রদ্ধায় কোমল হয়ে উঠল মন। কী চমৎকার কথা বলার ভঙ্গি। কী প্রাণ। কথায় কথায় ছন্দ এনে যেন ডুব আঁধারে ছড়িয়ে দেন কয়েক মুঠো আলোর দানা।
দীপের ফোন এল যখন, সে অভিভূত অবস্থার মধ্যে বলে উঠল, "হ্যাঁ, বলো।"
দীপ বলল, "রাগ করে আছ আমার ওপর? ফোন ধরবে না?"
"না না। নাটক দেখছিলাম। ফোন বন্ধ করেছিলাম, ভুলে গেছি।"
"হ্যাঁ। বললেন বউদি। রঞ্জু, রাগ করে থেকো না। কাল অন্যায় ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। আমি ক্ষমা চাইছি রঞ্জু।"
"ঠিক আছে।"
"না। ঠিক নেই রঞ্জু, এখানে তোমাকে না দেখে থাকতে আমার কষ্ট হয়। তার ওপর সারাক্ষণ ভয়, উদ্বেগ। মাঝে মাঝে মনে হয় পাগল হয়ে যাব। মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। কিন্তু এটা কোনও অজুহাত নয়। আমি কাল অন্যায় করেছি।"
"তোমাকে যেতে বারণ করা হয়েছিল।"
"আমাকে বুঝতে পারছ না তুমি রঞ্জু। এটাই আমার দুঃখ। আচ্ছা বলো, নাটক কেমন দেখলে?"
"ভাল।"
" কার সঙ্গে গেলে?"
"একা।"
"আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না গো? আমারও হচ্ছে। ভীষণ! খুব শিগগির আমি যাব তোমার কাছে। ছুটির জন্য আবেদন করেছি। মার্চে ইয়াওশ্যাঙ উৎসবে রজনীশ ছুটি নেবে। ও অবশ্য হিন্দু নয়। কিন্তু এখানে সবাই সবার উৎসবে যোগ দেয়। আর উৎসব যেন লেগেই আছে। বারো মাসে চোদ্দো পার্বণ। অক্টোবরে ছুটি নিচ্ছে রাকেশ। তার আগে, এই অগস্টে আমি। উফ! ভাবলেই মন ভাল হয়ে যাচ্ছে। আর দেড় মাস।"
দীপের উচ্ছ্বাসে লিপ্ত হতে পারছিল না রঞ্জাবতী। আরও কিছুক্ষণ কথা বলে দীপ যখন ফোন রেখে দিল, রঞ্জাবতী হাঁপ ছাড়ল একটু। দীপ যেন বড় কাতর সব সময়। চাকরি নিয়ে, প্রবাস নিয়ে, প্রেম নিয়ে, আতঙ্ক নিয়ে। বাড়ি আসবে সেই উচ্ছ্বাসেও কৃপণতা। কীরকম বোকার মতো বলল! যেন চাকরির দরখাস্ত পড়ে শোনাচ্ছে! রাতে শুতে এসে সে দেখল, দীপের আগমন বার্তার চেয়ে তার একথা ভাবতেই বেশি ভাল লাগছে, কাল কিংশুক আসবেন। কেন এমন হয়? কেন নতুন ভাল লাগা পুরনো ভাল লাগাকে দাবিয়ে দিয়ে ছুটিয়ে মারে? আগে রঞ্জাবতীর এমন হয়নি। তা হলে আজ কেন হল? প্রথম যেদিন কিংশুকের সঙ্গে ক্যাফেতে আড্ডা দিচ্ছিল, খানিক সংকুচিত ছিল সে। কিংশুক বলেছিলেন—রঞ্জাবতী লাজুক অতি। কইলে কথা, নেইকো ক্ষতি। দীপ আসার মধ্যবর্তী সময়টুকুর মধ্যে কিংশুকের সঙ্গে আরও কিছু নাটক দেখল সে। পড়ল। কফি হাউজ গেল। দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চে বসল। কিংশুকের প্রিয় এই জায়গা। অনেকগুলো বাচ্চা ছুটোছুটি করছিল। রঞ্জাবতী খুশি হয়ে উঠছিল দেখে। দু'-একজন কাছে এলেই সে কোলে তুলে নিচ্ছিল একটুখানি। কিংশুক বললেন, "বাচ্চা খুব ভালবাসো তুমি?"
"খুব।" বলল রঞ্জাবতী।
"তাহলে বিয়ে করে নিচ্ছ না কেন?"
"করতে চেয়েছিলাম। দীপ ভাল চাকরির অপেক্ষায় ছিল।"
"এখন তো ভাল চাকরি পেয়ে গেছেন।"
"হ্যাঁ। দেখি।"
"অবশ্য তোমার বিয়ে হয়ে গেলে এই বুড়োটা একটু মুশকিলে পড়ে যাবে।"
"নিজেকে বুড়ো বলতে খুব ভালবাসেন আপনি?"
"আমি তো বুড়োই। বাহান্ন হয়ে গেলাম।"
"ঠিক আঠাশ বছরের বড় আপনি আমার চেয়ে।"
"তবেই দেখো। তোমার বিয়েতে আমি কিন্তু নিমন্ত্রণে যাব না। আমায় ডেকো না। আমার খুব ঈর্ষা হবে।"
"কেন? আপনি তো এই বিশ্বজগৎকেই আপনার সঙ্গী করে তুলেছেন। আপনার মুশকিলই বা কী! আর ঈর্ষাই কী!"
"মনে জোর আনার জন্য বলি ওসব রঞ্জাবতী। আসলে আমার একাকিত্ব দূর দিগন্ত ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে তুমি জানো না। কিংশুক দত্তর হাল বোঝা শক্ত। হা হা! শোনো মেয়ে। এসব মনখারাপের কথা। শুনো না।"
"আপনি বিয়ে করেননি কেন?"
"করেছি তো। আমার ছেলের বয়স বাইশ। সে অত্যন্ত মেধাবী, সুন্দর। চমৎকার ঝকঝকে। সে তার মায়ের ছেলে। মা আর ছেলে আমাকে ভালবাসে না। তারা আলাদা থাকে।"
"আপনাকে ভালবাসে না? আপনাকে?"
"কেন? আমাকে বিশ্বসুদ্ধু সবাই ভালবাসবে কেন? আমি কি টেঁড়ি ভালুক? না কাঠবিড়ালি? ভালবাসা বস্তুটা তত নয় খাসা।"
"আচ্ছা বাবা! আচ্ছা।"
"আমার বউ ছেলে আমাকে ভালবাসে না, ব্যস।"
"বিবাহ বিচ্ছেদ?"
"না না। ওসব আইনের ঝামেলায় আর যাইনি। কী দরকার। আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না। ভালবাসা নেই, তাই একসঙ্গে থাকি না। চুকে গেল। ভালবাসা থাকতে থাকতে বিয়েটা সেরে নাও ছোট্টসোনা।"
রঞ্জাবতী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। উৎপল দত্তর নাটক পড়তে দিয়েছিলেন তাকে কিংশুক। বইখানা ব্যাগ থেকে বার করে রঞ্জাবতী বলল, "আগামী দু'সপ্তাহ আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না কিংশুক।"
"কেন? তুমি কাজে আসবে না?"
"না। পরশু থেকে ছুটি নিয়েছি। দীপ আসছে।"
"ও। আচ্ছা।" কিংশুক উঠে পড়লেন। তাঁর চোখে-মুখে বাচ্চা ছেলের মতো অভিমান। রঞ্জাবতীর কষ্ট হতে লাগল। সে কিংশুকের হাত ধরে বলল, "মাত্র তো দু'সপ্তাহ।"
"তাই তো।"
"আপনি কষ্ট পাচ্ছেন।"
"তাতে তোমার কী।"
"আচ্ছা! কী ছেলেমানুষি হচ্ছে!"

সে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল,
"দীপ কখন ফোন করবে
সেই অপেক্ষায় তো সারা
দিন বসে থাকতে পারি না।"

"কাল সারাদিন থাকবে আমার কাছে? একটা দিন? বাকি সব দিন তোমার ওই দীপবাবুর। দেখো, দু'সপ্তাহে আমি দু'টো নতুন নাটক লিখব ঘরে বসে বসে।"

"কাল যে আমাকে বুক ওয়ার্ল্ডে থাকতেই হবে। আচ্ছা পরশু থাকব আপনার সঙ্গে। সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় কাটাব এতটা সময়?"

"পরশু দীপবাবু আসছেন যে।"

"ঠিক আছে। ও একটা নাগাদ পৌঁছবে। আমি ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাব। বাকি দিনগুলো তো রইলই। এবার খুশি?"

"অসাধারণ। আপিস যাচ্ছ বলে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবে তুমি। ঝিরিঝিরি ঝিমিঝিমি বৃষ্টি হবে। ভুতোর মা খিচুড়ি রাঁধবে। আমি তোমাকে নাটক পড়ে শোনাব আহহহ! কতদিন এমন আনন্দ পাইনি গো।"

হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল তারা। খোলা রাস্তায়। কিংশুকের হাত ধরতে এখন একটুও অসুবিধে হয় না রঞ্জাবতীর। তার ছোট মুঠি ওঁর থাবায় পুরে ফেলেন তিনি। হাত ধরার মধ্যে কোনও মালিন্য থাকে না। তবু দীপ এসব একদম পছন্দ করত না। একদিন তাকে চুমু দিয়েছিল রঞ্জাবতী। হঠাৎ ইচ্ছার চকিত চুমচুম। দীপ বলেছিল, "এ কী রঞ্জু! সংযম ভেঙে গেলে আর থাকতে পারব না আমরা। ভেসে যাব। আর কখনও এমন কোরো না।"

দীপেরই যেন বাহান্ন বছর আরকিংশুকের আটাশ।

8

টালিগঞ্জ মেট্রোর অদূরেই দু'কামরার একটি ফ্ল্যাটে কিংশুকের আস্তানা। যতখানি এলোমেলো থাকবে বলে রঞ্জাবতীর মনে হয়েছিল, তেমন নয়। দেওয়াল জোড়া বইয়ের তাক। পরিষ্কার। ছোট বসার জায়গা। খবরের কাগজ গুছিয়ে রাখা। সে ঘুরে ঘুরে সব দেখল। সমস্ত দেওয়ালই প্রায় বইয়ের তাকে ঢেকে আছে। রান্নাঘর আলো ঝলমলে। কোথাও এতটুকু ঝুল-কালি নেই। কে এতসব করে? ভুতোর মা? কিংশুক নিজে এসব করেন রঞ্জাবতী কল্পনাও করতে পারল না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করল না সে। তার খুব ভাল লাগছিল। কিংশুক কফি তৈরি করছিলেন। একেবারে যন্ত্রে কফির দানা ফেলে গুঁড়ো করা। সাদা চুড়িদার আর পাঞ্জাবিতে তাঁকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগছে। রঞ্জাবতী বলল, "আপনি কেন ওই পুরসভায় কাজ করতে গেলেন?"

কিংশুক হেসে বললেন, "কেন?"

"আপনি অধ্যাপক হতে পারতেন, আইএএস হতে পারতেন। কিংবা জাতীয় পাঠাগারের পরিচালক।"

"আমি নাট্যকার হয়েছি। দেখো, গরিব ভারতীয়দের দুর্ভাগ্য এই যে তারা যা ভালবাসে তার থেকে অন্নসংস্থান করতে পারে না। আবার ভাতের জোগাড় করতে গিয়ে ভালবাসার বস্তুটি অবহেলা করে ফেলে। তুমি সত্যজিৎ রায়, প্রকাশ কর্মকার বা শুভাপ্রসন্নকে দিয়ে বিচার কোরো না। যদিও এঁরাও প্রত্যেকে সংগ্রাম করেছেন। তবু পরের দিকে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তুমি উৎপল দত্তর কথা ভাবো। মনোজ মিত্রর কথা ভাবো। কত বাংলা-হিন্দি ছায়াছবিতে কত অর্থহীন চরিত্রে তাঁরা অভিনয় করেছেন। কত রদ্দি সংলাপ বলেছেন। কেন? কারণ নাটকে ভালবাসা আছে, তৃপ্তি আছে, সম্মান, খ্যাতিও কম নেই। কিন্তু যা নেই, তা হল টাকা। টাকা নইলে যে কিছুই হয় না। আমি মশা-মারা বিভাগে চাকরি নিয়েছি, বেশ করেছি। আমি সেখানে ইচ্ছামতো যাই।

ফাঁকি দিই। মাইনেও পাই। মশা না মেরে আমি নাটক লিখি। খারাপ করি?"
"কিন্তু চাকরির প্রতিও তো দায়বদ্ধতা থাকা দরকার।"
"নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষ যন্ত্র নয়। রাষ্ট্র হৃদয়হীন এবং নির্বুদ্ধি হলেই তার প্রতিভাবান নাগরিকবৃন্দ বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির চর্চা করবে না, এরকম হতে পারে না। আজ যদি আমাকে বলা হত চেখভের কী বেকেটের সমস্ত নাটক বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে বেতন দেওয়া হবে, আমি একটুও ফাঁকি দিতাম না।"
কিংশুকের ফোন এল। নিঃশব্দ করে রেখেছিলেন তিনি। টেবিলের ওপর তা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। কম্পনের কারণে অদ্ভুত গোঙানির মতো শব্দ হয়। রঞ্জাবতীর এই শব্দ ভাল লাগে না। সে ফোন নিয়ে কিংশুকের হাতে দিল। তিনি নামটি দেখে নিয়ে সাড়া দিলেন, "হ্যাঁ। বলো। কী ব্যাপার।... মঞ্চ পরিকল্পনার ছক এঁকেছ? বেশ করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের বলে এসেছিলাম সুমন,

খুব সুন্দর আল্পনা কেউ মাড়িয়ে দিলে যেমন রাগ হয়, বিশ্রী লাগে, রঞ্জাবতীর সেইরকম লাগছিল।

আমাকে আজ তোমরা কেউ বিরক্ত করবে না। আর একটি ফোনও আমি ধরব না বলে রাখলাম।"
তিনি রঞ্জাবতীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, "আজ গোটা দিন এই ছোট্ট মেয়ের জন্য।"
খুব সুন্দরভাবে যাচ্ছিল সময়। সে নিজের ফোন নিরুচ্চার করে ব্যাগে রেখে দিয়েছিল। কিংশুকের যত ফোন আসে, তার তত আসে না। তবু, এই সময়টুকু সেও নিরুপদ্রব রাখতে চাইছিল। কিন্তু, ব্যাগের গা কাঁপিয়ে তিনটে নাগাদ দীপের ফোন এল—রঞ্জু, আমি এসে গেছি। আজও কেন কাজে গেলে তুমি? ছুটি নেবে বলেছিলে।
রঞ্জাবতী বলল, "কাজ ছিল দীপ। আমি ছ'টা নাগাদ ফিরব।"
"তাড়াতাড়ি চলে এসো না রঞ্জু। খুব তাড়াতাড়ি।"
"দীপ, আমার কাজটাকেও একটু গুরুত্ব দাও।" সে ফোন রেখে দিল। কিংশুক বললেন,"এভাবে বললে কেন? দীপবাবু কষ্ট পেলেন।"
খুব সুন্দর আল্পনা কেউ মাড়িয়ে দিলে যেমন রাগ হয়, বিশ্রী লাগে, রঞ্জাবতীর সেইরকম লাগছিল। কেন যে সে দীপের প্রতি কথায় এভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠছে, সে বুঝতে পারছে না। সত্যিই এরকম বলা উচিৎ হয়নি।। সে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে এল। কিংশুক বললেন, "চলো, তোমাকে গান শোনাই। রুক্মিণীবাই নামে একজন অখ্যাত কিন্তু বড় শিল্পীর গান। খিচুড়িটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কী বলো?"
কিংশুক এতক্ষণে রঞ্জাবতীকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলেন, এঘরেও বই ভর্তি। কোনও পালঙ্ক নেই। মেঝেতেই পরিপাটি বিছানা পাতা। একটি লেখাপড়ার টেবিল, চেয়ার। তাকে, বইপত্রের মাঝখানে, গানের সরঞ্জাম। রঞ্জাবতী বলল, "এতসব কে গোছায়, কে সাজায়, ভৃত্যের মা?"
কিংশুক গম্ভীর মুখে বললেন, "ধরে নাও।"
"আপনার কত কাজ, কত পড়া, ব্যস্ততা—তার মধ্যে আমার জন্য সারা দিন ব্যয় করে দিলেন কেন?"
"তোমার জন্য নয়। আমার জন্য। আমার শান্তির জন্য। তোমাকে আমার ভাল লাগে যে। প্রথম যেদিন দেখেছি, যে মুহূর্তে দেখেছি, ভালবেসেছি।"
কিংশুক বললেন, "তুমিও তো এসেছ রঞ্জাবতী। তোমার দীপ এসেছে আজ। তুমি ছুটি নিয়েছিলে, তবুও তো তুমি এসেছ। কেন এলে?"
"আপনার জন্য। আপনার ভাল লাগবে বলে।"
"আমার ভাল লাগা নিয়ে তোমার এত চিন্তা কীসের?"
ফিসফিসে হয়ে এসেছে কিংশুকের স্বর। মন্দ্র কণ্ঠ। নিচু আওয়াজে রুক্মিণীবাই গাইছেন—প্রিয় আমায় পাগল করো কীসে। শরীর জ্বলে ভালবাসার বিষে।... ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই দুটি পংক্তি। রঞ্জাবতী বসে পড়েছে। কিংশুক বসলেন পাশে। কাঁধ জড়িয়ে এক ঝটকায় তাকে গায়ে টেনে নিলেন। চাপা তীব্র ভারী স্বরে বললেন, "সত্যিটা দেখতে পাও না, না?"
রঞ্জাবতী বলতে লাগল, "কীসের সত্যি?"
"পারে না। পারো না। কেউ পারো না। তোমরা কেউ আমাকে বুঝতে পারো না। শুধু ছেড়ে যাও। শুধু ভান করো। চাবুকে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে যাই তোমরা দেখতে পাও না।" যেন গলার শিরা-ধমনি ছিঁড়ে যাবে এমন উচ্চারণ। যেন শেক্সপিয়ারের নাটকের সংলাপ। কিংশুক অভিভূত রঞ্জাবতীকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তীব্রভাবে বলতে লাগলেন, "শিশু চাও না তুমি? বাচ্চা চাও না? পারি। পারি। আমি পারি তোমার গর্ভে আমার বীজ ভরে দিতে। কিন্তু আমার বীজ গর্ভে ধরে এমন ক্ষমতা কার? কোন নারীর? সে কি তুমি? তুমি?" কিংশুক ডুকরে কেঁদে উঠলেন। দু'হাতে মুখ চাপা। পিঠ কাঁপছে। কী সুন্দর পিঠ। রঞ্জাবতী বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে। কিংশুককে তার অচেনা লাগছে। ভয় করছে। এই তীব্র আবেগ—একে সে কীভাবে সামলাবে! কিংশুক নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। চশমা খুলে চোখ মুছলেন। রুমালে নাক পুছে বললেন, "কিছু মনে কোরো না। আমি তোমাকে ভালবাসি, তার মানে এই নয় আমি তোমাকে চাই। তোমার শরীরে আমার লোভ নেই রঞ্জাবতী। আজ আর যাব না তোমার সঙ্গে। একলা থাকব। তুমি সাবধানে চলে যেও। দীপবাবুর মনে কষ্ট দিও না।"

৫

বাড়িতে ঢুকেই সে দেখল, অরুণেশ আজ তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছে। দীপ, আলোকময়ী, দেবিকা এমনকী রন্টি পর্যন্ত জমিয়ে আড্ডা মারছে। তাকে দেখেই দেবিকা বলল, " কোথায় গিয়েছিলি রে তুই দীপ 'বুক ওয়ার্ল্ডে' গিয়ে তোকে পায়নি।"
দীপ 'বুক ওয়ার্ল্ডে' গিয়েছিল? লুকিয়ে অনুসরণ করছে তাকে দীপ? সন্দেহ করছে? একবারও রঞ্জাবতীর মনে হল না, তাকে দেখার কত ব্যাকুল আর্তিতে দীপ বিমান বন্দর থেকে সোজা পার্ক স্ট্রিটে এসেছিল। মনে হল না, দীপ পৌঁছল কি না জানার জন্য একবারও সে ফোন করেনি কাউকে, এটা ঠিক নয়। সে গম্ভীর মুখে বলল, "আমি কোথায় কখন কেন যাচ্ছি, তার সমস্ত কৈফিয়ত সবার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই বউদি।"
স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। এ কীরকম রুক্ষতা মেয়েটার! সে তো এমন ছিল না! কোনও কারণে মন খারাপ? তা হলে বলবে না কেন? এখানে তো সবাই আপনজন।

আলোকময়ী ও দীপের নৈশাহারের আয়োজন নিজের বাড়িতেই করেছিল দেবিকা। এতদিন পরে ছেলেটা এসেছে। সকালবেলায় তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেল রঞ্জাবতী, তাকে আর জানানো হয়নি। আলোকময়ীর ভাল লাগছিল না। যে সমস্যাই থাকুক, দীপ এতদিন বাদে এসেছে, তার জন্য ছিটেফোঁটা আনন্দও তো ছিল না মেয়েটার মুখে। যার সবচেয়ে খুশি হওয়ার কথা, সেই এত বিরক্ত! দীপ তো খিটখিটে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত নয়। ওখানে কত কষ্ট, কত উদ্বেগ! মাঝে মাঝে আলোকময়ীকেও ঝাঁঝিয়ে ওঠে। তার মানে কি মাকে সে আর ভালবাসে না? পাছে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়ে পরিস্থিতি আরও তিক্ত করে তোলে, তাই আলোকময়ী বললেন, "বাড়িতে কিছু কাজ আছে দেবিকা। আমি বরং সেরে আসি। ন'টা নাগাদ চলে আসব।"

দেবিকা জানে, এখুনি যাবার পরিকল্পনা ছিল না আলোকময়ীর। এতকালের চেনাজানা। আত্মীয়ের মতোই। তবু ভারী লজ্জা করতে লাগল তার। অরুণেশের মুখ থমথমে। রিন্টু দীপকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার নতুন কম্পিউটার দেখাবে বলে।

দেবিকা রান্নাঘরের দিকে গেল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে নিজের ঘরের দরজা খুলল রঞ্জাবতী। রিন্টু দীপের কাঁধ চাপড়ে বলল, "চলে যাও দীপকাকু। তোমার গার্লফ্রেন্ড স্নান শেষ করেছে।"

দীপ রিন্টুর গাল টিপে দিল। তারও আর দেরি সইছে না। সে রঞ্জাবতীর দরজায় এসে বলল, "আসতে পারি?"

"হ্যাঁ। এসো।" সাড়া দিল সে। দীপ ভিতরে এসে বলল, "কতদিন পর দেখলাম তোমাকে রঞ্জু!"

"হ্যাঁ। স্বাভাবিক।"

"তুমি এখনও আমার ওপর রাগ করে আছ?"

"না।"

"আছ। আমি লক্ষ করেছি ইদানীং ফোনে কথা বলার সময় তুমি রেখে দিতে পারলে বাঁচো। হুঁ হাঁ করো। কী হয়েছে খুলে না বললে আমরা সমস্যা মেটাব কী করে রঞ্জু। এতদিন পরে দেখা হল, তুমি হাসলে না পর্যন্ত। এখনও গোমড়া হয়ে আছ। কী এমন হয়েছে রঞ্জু যে আমাদের সবার কাছে তোমাকে মিথ্যা বলতে হয়!"

"কী মিথ্যা বলেছি আমি?"

"রঞ্জু, তুমি শুধু মিথ্যে কথাই বলোনি। বউদিকে অপমান করেছ। খানিকটা অরুণদা এবং মাকেও করেছ। অতজনের মধ্যে ওইভাবে বউদির সঙ্গে কথা বললে তুমি? কেন? কী হয়েছে তোমার?"

"আচ্ছা, তুমি কি আমার সব কিছুর কৈফিয়ত চাইবে?"

"তুমি কোনও ভুল করলে নিশ্চয়ই চাইব। আমি ভুল করলে তুমি চেয়ো। বাড়িতে বলেছ তুমি আপিস গিয়েছে। আমাকে বলেছিলে তোমার আজ থেকে ছুটি। কলকাতায় পৌঁছে প্রথমে তোমাকে ফোন করেছি, তুমি ধরোনি। বউদিকে করলাম, বলল তুমি আপিসে। বুক ওয়ার্ল্ড গেলাম, বলল তোমার ছুটি। এখনও তুমি বলছ না কোথায় গিয়েছিলে। আমাকেও বলছ না।"

"আমি সব কিছু বলতে বাধ্য নই।"

"বেশ। আমি জোর করব না। শোনো রঞ্জু, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। ফিরে যাবার আগে আমরা বিয়ে করে নেব।"

"আগে থেকে নোটিশ দিতে হয়।"

"সে রেজিষ্ট্রি পরে হবে। আমরা অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করব রঞ্জু। আর তো দু'টো বছর। ঠিক কাটিয়ে দেব। ততদিন তুমি এবাড়ি ওবাড়ি করে থেকে যাও।"

"ওঃ! তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে না আমাকে?"

"রঞ্জু, সেটা সম্ভব নয়। তুমি জানো ওখানে কত বিপদ, কত সমস্যা। পরের বছর ডোলং থেকে হয়তো সেনাপতি জেলায় পাঠিয়ে দেবে আমাকে। মায়ানমার সীমান্তে কোথাও থাকতে হবে।"

"তোমার সঙ্গেই যদি থাকতে না পারি, বিয়ে করে কী হবে দীপ? বেঁধে রাখবে?"

"নতুন করে বাঁধবার আর কী আছে রঞ্জু? দেখো, কাজটা আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে কাজ করেছি। কিন্তু পারছি। আমি ঠিক পেরে যাব, দেখো তুমি। তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে। বাচ্চা হোক, চেয়েছিলে। এখন তো আমরা শুরু করতেই পারি।"

"আমাকে ভাবতে হবে।"

"নিশ্চয়ই। ভাবো। আমিও অন্যদের জানাই।"

খেতে বসে প্রসঙ্গ উত্থাপন করল দীপ। কেউ-ই তার প্রস্তাবে অমত করল না। অরুণেশ বলল, "খুব ভাল। আমারা দ্রুত আয়োজন করে ফেলব। আজকাল বিয়ের ব্যবস্থা করা কোনও ব্যাপারই না। এটা বাংলার কী? শ্রাবণ না? শ্রাবণে বিয়ে হয় তো!"

রঞ্জাবতী স্পষ্ট বলল, "আমার আপত্তি আছে দাদা।"

"আপত্তি!!" রিন্টু সহ সবাই সবিস্ময়ে তাকাল তার দিকে। "কী বলছিস! এটাই তো সবচেয়ে ভাল।"

"না। ও ফিরে আসুক, তারপর।"

দীপ ভেবেছিল বিয়ের কথা বললেই রঞ্জাবতীর সব রাগ, সব ক্ষোভ চলে যাবে। আনন্দে ভাসবে তারা এই দু'সপ্তাহ। ডোলঙে তার খরচ খুব কম। প্রচুর টাকা সে এরই মধ্যে জমিয়ে তুলেছে। লক্ষাধিক। এক বছর আগে এ টাকার কথা সে ভাবতেও পারত না। কিন্তু তার সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল। রঞ্জাবতী, তার আশৈশব চেনা রঞ্জু হঠাৎ কেমন জটিল, কঠিন, দুষ্প্রাবেশ্য হয়ে উঠেছে। কোথাও বেড়ানো হল না, সিনেমা দেখা হল না, রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়া হল না। সপ্তাহ কেটে গেল শুধু রঞ্জাবতীকে বুঝতে চেয়ে। অনেক ভাবল দীপ। রাত দিন ভাবল। অতঃপর, যে প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলে তার মন আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা পেটফোলা মরা বেড়ালের মতো হয়ে উঠবে, সেই প্রশ্নটাই সে করল তার প্রিয় নারীকে। বলল, "সত্যি করে বলো, তুমি কি অন্য কারও প্রেমে পড়েছ?"

রঞ্জাবতী বিচলিত হয়ে উঠল। কেঁদে ফেলল। এবং খানিক কেঁদে, খানিক শক্ত করে নিজেকে, বলল, "দীপ আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।"

"কেন রঞ্জু? কেন?"

"দীপ, তোমার জন্য আমার আর কোনও অনুভূতি হয় না। আমি, আমি জানি না, কেন, কীভাবে, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক মারা গেছে।"

"না রঞ্জু। তা হতে পারে নাকি? তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারবে না। আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম, কত কাঁদছিলে তুমি। এর মধ্যে কী এমন হল বলো? কে এসেছে তোমার জীবনে? তাকে ছেড়ে এসো রঞ্জু। আমি কোনওদিন কিছু জানতে চাইব না। তুমি ফিরে এসো।"

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। এ কীরকম রুক্ষতা মেয়েটার! সে তো এমন ছিল না! কোনও কারণে মন খারাপ?

বিশাল ভূমিকম্পে যেমন সমতল ভূখণ্ড ফাটিয়ে গভীর গহ্বর তৈরি হয়, তেমনি হল দু'জনের মাঝখানে। একমাথা কাঁচা চুলের মধ্যে একটিও পাকা চুল দেখলে মেয়েরা যে নির্মমতায় তাকে উপড়ে ফেলে, তেমনি করে রঞ্জাবতী দীপকে উপড়ে ফেলল জীবন থেকে। দীপ একটা ধ্বংস্তূপের মতো ফিরে গেল ডোলং।

৬

"কিংশুক আমি পারিনি। আমি দীপকে নিতে পারলাম না।"
পাগলের মতো কিংশুকের বাড়িতে এসে বলেছিল রঞ্জাবতী। কিংশুক তাকে শরীরে পিষে ফেলতে ফেলতে বলেছিলেন,
"আমার সোনা, আমার ছোট্ট পাখি, আমি জানতাম, আমি জানতাম তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।"
কিংশুক হাসছেন, কাঁদছেন। প্রবল আবেগে ছোট বাচ্চার মতো করতালি দিয়ে নাচছেন। রঞ্জাবতীকে দিনের পর দিন যেন ভূতে পেয়েছে রঞ্জাবতীকে।
একদিন দেবিকা বলল, "দীপ বিয়ে করছে। এখনও সময় আছে রঞ্জু।"
"কীসের?"
"দীপ আজও তোকে বিয়ে করতে চায়।"
"আমি চাই না। এসব আর বোলো না।"
আজকাল কিংশুকের বাড়িতেই সে যায় বেশি। মাঝে মধ্যে দেশপ্রিয় পার্কে বসে। দীপ বিয়ে করছে শুনে রঞ্জাবতীর মনে হল, তাই তো, এক বছর হয়ে গেল সে দীপকে ছেড়ে এসেছে, মনে হয় দীপ কত দূরের, যেন গতজন্মের কেউ। মনে হয়, এ জীবনের প্রতিটি শ্বাস নেয় সে কিংশুকেরই জন্য। সব আছে। সব হচ্ছে। সব উদ্যোগ আয়োজন ত্রুটিহীন। শুধু কিংশুকের বিবাহবিচ্ছেদ স্থগিত থাকছে দিনের পর দিন। কিংশুকের স্ত্রী তাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না।
রঞ্জাবতী একটু বেশিই বলতে লাগল বিচ্ছেদ মামলার জন্য। কিংশুক বললেন, "কীসের অপেক্ষা ছোট্ট মেয়ে? তুমি এসে থাকো আমার কাছে।"

দীপ ভেবেছিল বিয়ের কথা বললেই রঞ্জাবতীর সব রাগ চলে যাবে। আনন্দে ভাসবে তারা এই দু'সপ্তাহ।

শুধু আদর, শুধু প্রেম, শুধু স্বপ্ন দেখা, আর বিশ্রম্ভালাপ।
কিংশুক বলেন, "এইবার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করব আমি। আমার মুক্তি চাই।"
পার হয়ে গেল একবছর। এখন দেবিকা ও অরুণেশ জানে, রঞ্জাবতী নাট্যকার অভিনেতা কিংশুক দত্তকে বিয়ে করবে। লোকটার বিবাহবিচ্ছেদ হলেই।
অরুণেশের কোনও ধারণাই ছিল না কিংশুক দত্তর সম্পর্কে। সব জেনে, এখন সে বিষণ্ণ। উদ্বিগ্ন। দেবিকা বুঝিয়েছে কত। অরুণেশ বুঝিয়েছে। ফল হয়নি। তারা কান্নাকাটি করেছে।
"লোকটা খারাপ।" বলেছে তারা।
"ভুল। ওরকম মানুষ হয় না।" বলেছে রঞ্জাবতী।
"লোকটা তোর আড়াইগুণ বয়সি। ওর ছেলেই তো তোর সমান।"
"জানি তা।"
"লোকটা দুশ্চরিত্র। মেয়ে পটানো ধরনের।"
"ও আমাকে ভালবাসে।"
"না।"
"কেন না?"
"আমি পারব না।"
"বিয়ে করলে যা যা করতে, তার সবই কি তুমি আমার সঙ্গে করছ না?"
"সব করছি? সব? স্ত্রী হয়েছি? মা হয়েছি? সামাজিক স্বীকৃতি, সম্মান—পেয়েছি কিছু?"
"মিত্রার সঙ্গে কথা বলছি তো আমি। বিশ্বাস করো। সমঝোতা করে নিতে চাইছি। তুমি তো জানো সোনা, একতরফা মামলা করলে কবে নিষ্পত্তি হবে তার ঠিক নেই। মিত্রাকে আমি সব বলেছি। তোমার কথা। আমাদের ইচ্ছার কথা। দেখো, শিগগির সব মিটে যাবে।"

৭

আরও তিন বছর গড়িয়ে গেল। কিংশুক ও মিত্রার সমঝোতা রঞ্জাবতীর স্বপ্নকে পুরনো করে তুলল কেবল। আজকাল রঞ্জাবতীকে কেমন নির্জীব মনে হয়। দীপের কথা তার মনে পড়ে কিন্তু কষ্ট বোধ করে না। বরং, কিংশুককে দু'দিন না দেখতে পেলে তার পাগল পাগল লাগে। এখন রঞ্জাবতী বসে আছে দেশপ্রিয় পার্কে। সঙ্গে কিংশুক আছেন। খুব জরুরি আলোচনা আছে আজ। রঞ্জাবতী এখন মধ্য উনত্রিশ।
কিংশুক তাঁর জলদনিন্দিত স্বরে কিছু বলে চলেছেন, রঞ্জাবতী মুখ নিচু করে শুনছে। বাচ্চারা আশেপাশে খেলছে।
একটি রং-বেরঙের বল গড়িয়ে এল রঞ্জাবতীর কাছে। সদ্য ছুটতে শেখা বাচ্চাটা এল তা অনুসরণ করে। কাছাকাছি এসে সে উলটে পড়ল। কাঁদছে। রঞ্জাবতী উঠে পড়ল। কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। আদর করে কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। খুব দ্রুত পায়ে এক যুবক হেঁটে আসছে। কালো, লম্বা, চোখে চশমা। রঞ্জাবতীর কাছে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে নিল। একটি কথাও না বলে ফিরে গেল।
হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জাবতী। তার মনে হল, কিংশুক আজকাল কথায় কথায় ছন্দ গড়ে তোলেন না তো! ছন্দোবদ্ধ সংলাপ শেষ কবে শুনেছিল সে? মনে তো পড়ে না! হঠাৎ যেন উন্মাদিনী হয়ে গেল সে। ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিংশুকের ওপর। কিল চড় ঘুষি আঁচড়। কিংশুকের চশমার কাচ ভেঙে কেটে গেল গাল। ভিড় জমে গেল। অসংলগ্ন যাচ্ছে রঞ্জাবতীর শাড়ি। প্রায় মূর্ছিত কিংশুকের মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে। বলছে—কেন এমন করলে? কেন? কেন? কেন?
ভিড় থেকে এক মহিলা হাত টানছেন তার। তিনি জানেন না, জানে না ওই ভিড়, একটু আগে কিংশুক রঞ্জাবতীকে যা বলছিলেন তার মর্মার্থ, তাঁর স্ত্রী মিত্রা কিংশুককে ক্ষমা করেছেন। মা আর ছেলে ফিরে এসেছে টালিগঞ্জের বাসস্থানে। তাঁদের সমঝোতা হয়ে গিয়েছে।
ওই ভিড় জানে না, জানেন না কিংশুক—খানিক আগে যে বাচ্চাটিকে আদর করছিল রঞ্জাবতী, তার বাবা, রঞ্জাবতীর ঠকরে ফেলা দীপ।
বাচ্চা কোলে দীপ নিশ্চয়ই ওই ভিড়ে দাঁড়ায়নি! দাঁড়ালে তার কান্না পেত। সঙ্গে বউও ছিল নিশ্চয়ই। এসব দেখে বউকে কী বলত সে? ওই ওকে, ওই আলুথালু মেয়েটাকে আমি ভালবাসতাম! বলত? নাকি বলত না কিছুই। কাউকে কিছুই না বলে কাটিয়ে দিত নিদ্রাহীন রাত, যে সব রাতে রঞ্জাবতীরা আজও অতৃপ্ত জোনাকির মতো উড়ে বেড়ায়।

অলংকরণ: প্রসেনজিৎ নাথ